দৈনিক সংবাদ

তারিখ 26 JUL 1989
পৃষ্ঠা 4 কলাম 3

সেশনজট : পরীক্ষা বন্ধ থাকাটাই একমাত্র কারণ নয়

আবু তাহের খান

সেশন জট স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে একটি বহুল আলোচিত প্রসঙ্গ এবং আমাদের শিক্ষাঙ্গনে বিরাজমান অন্যতম প্রধান সমস্যা।

'৭১-এর ন'মাসের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় শিক্ষাঙ্গনেও অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। বিপুল সংখ্যক তরুণ শিক্ষার্থী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে যোগদান করেন মুক্তিযুদ্ধে। যুদ্ধশেষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পুনরায় চালু হলে সে ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যে সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় তা হল হারিয়ে যাওয়া একটি শিক্ষাবর্ষকে চলতি সময়ের সাথে সমন্বয় সাধনের জটিলতা। আর সেই থেকে শুরু এই সেশন জটের। অবশ্য সেশন জটের শুরু সেখান থেকে হলেও বর্তমানে তা যে ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করেছে, তার অধিকাংশের জন্যই দায়ী কিন্তু অন্যান্য কারণ-- ন' মাসের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার ক্লাস বন্ধ থাকাটা সে ক্ষেত্রে একটি অতি ছোট্ট অনুষঙ্গ মাত্র। তাছাড়া ন'মাস বা এক বছরের সেশন জটের জটিলতা বলতে গেলে প্রায় পরের দু'বছরেই মিটে গিয়েছিল। দৃষ্টান্ত হিসেবে এস এস সি ও এইচ এস সি পরীক্ষার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৭১ এবং ১৯৭২ সালের এস এস সি ও এইচ এস সি পরীক্ষা দু'টিই ১৯৭২ সালে সম্পন্ন হয়ে যাওয়ায় ১৯৭৩ সাল থেকে এস এস সি ও এইচ এস সি পরীক্ষার ক্ষেত্রে সেশন জটের মত কোন জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি এবং বর্তমানেও তা নেই। আসল সমস্যাটা দেখা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে। এক বছরের সেশন জটের জটিলতা বর্তমানে চার-পাঁচ বছরে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কেন?

নানা কারণে ঘন ঘন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়াটাই বর্তমান সময়ে সেশন জটের সর্বাধিক আলোচিত কারণ হিসেবে পরিচিত। সন্দেহ নেই, সেশন জটের পেছনে এই ক্লাস বন্ধ থাকার একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু ক্লাস বন্ধ থাকাটাই যে সেশন জটের একমাত্র কারণ নয়--সে বিষয়ে ধারণাটি বলতে গেলে সংশ্লিষ্ট মহলে খুব কমই আমল পেয়েছে বলে মনে হয়। ফলে সেশন জট নিরসনকল্পে গৃহীত উদ্যোগের ক্ষেত্রে ক্লাস বন্ধ থাকার বিষয়টিকে যতটা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে বা হচ্ছে, অন্যান্য কারণগুলোকে সেভাবে দেখা হচ্ছে [illegible] না বলে এক্ষেত্রে প্রকৃত অগ্রগতি বিঘ্নিত হচ্ছে বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

ক্লাস বন্ধ থাকা ছাড়া সেশন জটের অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে বিলম্বে পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা ও বার বার তা পিছানো, সময়মত পরীক্ষার ফল প্রকাশ না করা, যথাসময়ে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠান ও ভর্তির ব্যবস্থা না করা, বিলম্বে ক্লাস শুরু করা, ক্লাস চলাকালীন সময়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক ক্লাস না নেয়া ইত্যাদি।

বিলম্বে পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা ও বার বার তা পিছানোর বিষয়টি মুখ্যতঃ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক অদক্ষতা ও দায়িত্ব অবহেলারই ফলশ্রুতি। পরীক্ষা পিছানোর ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে কিছু কিছু অপরিনামদর্শী শিক্ষার্থীর উৎসাহ এবং চাপ কাজ করলেও দায়িত্বসচেতন কর্তৃপক্ষের পক্ষে তা এড়ানো অসম্ভব কিছু নয়। তবে এ বিষয়ে সাম্প্রতিক বছরগুলোর পরিসংখ্যান নিলে হয়তো দেখা যাবে যে, ছাত্রদের উৎসাহ বা চাপে পরীক্ষা পিছানোর সংখ্যার চেয়ে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ইচ্ছায় বিলম্বে পরীক্ষা গ্রহণের সংখ্যাই অধিক হবে। উদাহরণ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন স্নাতক (পাস) পরীক্ষার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় প্রতি বছরই এ পরীক্ষাটি কর্তৃপক্ষের ইচ্ছায় কমপক্ষে এক থেকে চার বার পর্যন্ত ছিপানো হয়েছে। আর ফল ঘোষণার ক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট দায়িত্বহীনতা পরীক্ষা পিছানোর মাত্রাকেও অতিক্রম করে গেছে। কোন কোন বছর এ পরীক্ষার ফল প্রকাশে ন'মাস পর্যন্ত সময় নেয়া হয়েছে। স্নাতক (পাস) পরীক্ষা সংক্রান্ত এ অবস্থাটি শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেই নয় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এ ক্ষেত্রে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সৃষ্ট রেকর্ড আরো হতাশাব্যঞ্জক। সেখানকার ১৯৮৮ সালের স্নাতক (পাস) পরীক্ষা ১৯৮৯ সালের এই মাঝামাঝিতে এসেও গ্রহণ করা হয়নি। অথচ এ ক্ষেত্রে সেশন জটের সমস্যা সত্তুর দশকেই মিটে গিয়েছিল। বর্তমানে জটিলতা [illegible]

বিলম্বে পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা ও বার বার সে তারিখ পিছানো এবং বিলম্বে ফল প্রকাশের বিষয়টি স্নাতক (পাস) পরীক্ষার ন্যায় সনাতন পদ্ধতির ক্ষেত্রেই শুধু নয়--সেমিস্টার ও কোর্স সিস্টেমের পরীক্ষার ক্ষেত্রেও এবং প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই অহরহ ঘটে চলেছে। সনাতন পদ্ধতির পরীক্ষাগুলোর আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক থাকার কারণে এবং তাদের বিস্তৃতি দেশব্যাপী হওয়ার প্রেক্ষিতে পরীক্ষা পিছানো ও বিলম্বে ফল প্রকাশের পক্ষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কিছুটা যুক্তি দেখানোর চেষ্টা হয়তো করবেন (যে যুক্তি আসলে নিজেদের দায়িত্বহীনতাকেই আড়াল করার প্রয়াস), কিন্তু সেমিস্টার ও কোর্স সিস্টেমের ন্যায় সীমিত পরিসরের পরীক্ষার ক্ষেত্রে এরূপ ঘটার বিষয়কে কর্তৃপক্ষ কোন যুক্তিতে যথার্থ প্রমাণ করতে সচেষ্ট হলেন? আসলে এ সকল ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের অদক্ষতার পাশাপাশি এক শ্রেণীর দায়িত্বজ্ঞানহীন (বিশেষণটি রূঢ় শোনালেও সত্য) শিক্ষকদের কর্তব্যকর্মে গাফিলতিও কম দায়ী নয়। বিলম্বে ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে কোন কোন শিক্ষক কর্তৃক যথাসময়ে উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও জমা না দেয়ার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। কিন্তু এ অবস্থার নিরসনকল্পে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ অদ্যাবধি কোন বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন কি? কর্তব্যকর্মে অবহেলার বিষয়টি সবার ক্ষেত্রেই নিন্দনীয় ও শাস্তিযোগ্য এবং একজন শিক্ষকের ক্ষেত্রেও তা সমানভাবে প্রযোজ্য। শিক্ষকের ক্ষেত্রে অপরাধটি বরং আরো অধিক গর্হিত। কারণ তিনি ন্যায়বোধ ও আচরণের শিক্ষা এবং অন্যায়কে সনাক্ত করার জ্ঞানদানের দায়িত্বে নিয়োজিত। এই মহৎ দায়িত্বে নিয়োজিত কোন কোন শিক্ষক যখন উপর্যুপরি দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেন, বিশেষ করে তার সে দায়িত্বহীনতার জন্য যখন ব্যাপক সংখ্যক শিক্ষার্থী প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন তখন তার জন্য শাস্তির বিধান আরোপ শুধু যুক্তিসংগতই নয়, অপরিহার্যও বটে। কোন শিক্ষক উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অযৌক্তিকভাবে বিলম্ব করলে পরবর্তী সময়ে

দৈনিক সংবাদ

26 JUL 1989
4-3

[illegible] যা যেতে পারে।

যথাসময়ে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ ও ভর্তির ব্যবস্থা না করার বিষয়টি সেশন জটের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম প্রধান কারণ। দেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে এবং পুরো ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ করতে সময় নেয়া হচ্ছে তারচেয়েও বেশী। স্বাভাবিক ক্ষেত্রে এইচ এস সি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর পরই স্নাতক পর্যায়ের ভর্তির আনুষ্ঠানিকতা শুরু আয়োজন করার কথা থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা করা হচ্ছে না। কোন কোন ক্ষেত্রে সেশন জটের মাত্রাতিরিক্ত চাপের কারণে তা করা সম্ভব না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ঘটছে প্রশাসনিক জটিলতা ও অদক্ষতার কারণে। তাছাড়া ভর্তি প্রক্রিয়ায় বিলম্ব ঘটিয়ে সেশন জটের সমস্যাকে আরো অধিক জটিল করে তোলা বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না। এখানে উল্লেখ্য যে, সেশন জটের জটিলতা নিরসনের জন্য ইতিপূর্বে ১৯৭৬ ও ১৯৭৭ সালে উত্তীর্ণ এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের দুটি ব্যাচকে একত্রিত করে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু হাজার হাজার শিক্ষার্থীর জীবন থেকে এক বছর ছিনিয়ে নিয়েও এ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ উল্লেখযোগ্য কোন সাফল্য প্রদর্শনে সক্ষম না হওয়ার পর বুঝতেই হবে কর্তৃপক্ষের দক্ষতার মাত্রা কোন্ পর্যায়ে নেমে এসেছে।

ভর্তি পরীক্ষা আয়োজনের বিলম্ব যে কতটা চরমে পৌছেছে তার একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক সম্মান শ্রেণীর ভর্তির সাম্প্রতিক বিজ্ঞপ্তি থেকে। ১৯৮৮ সালে এইচএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ভর্তির জন্য (১৯৮৮-৮৯ শিক্ষাবর্ষে) সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে মাত্র কিছুদিন আগে। অনুমান করা যায়, দরখাস্ত গ্রহণ থেকে চূড়ান্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে ১৯৮৯ সালের পুরোটাই (অর্থাৎ ১৯৮৯-৯০ শিক্ষাবর্ষেরও অর্ধেক) হয়তো পার হয়ে যাবে। অর্থাৎ ভর্তি হতে হতেই দেড় বছর শেষ। ক্লাস শুরু হতে আরো কতদিন অনিশ্চিত। [illegible] জট যে সেখানে [illegible] থাকবে তাতে অবাক [illegible] কিছু নেই। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা আবশ্যক যে, শুধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নয়, অন্যান্য আরো একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়েও ১৯৮৮-৮৯ সালের শিক্ষাবর্ষে ছাত্র ভর্তির প্রক্রিয়া এখনো সম্পন্ন হয়নি এবং তা সম্পন্ন হতে '৮৯ সাল শেষ না হলেও ক্লাস শুরু হতে নিশ্চয় '৯০ সাল এসে যাবে। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়-বহির্ভূত আর একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ আনলে তা খুব একটা অপ্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে হয় না। ঘটনাটি হচ্ছে : ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ১৯৮৭-৮৮ সালে ভর্তি হওয়া ছাত্র ছাত্রীদের দীর্ঘ প্রায় দু'বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এখনও ক্লাস শুরু হয়নি। মনে রাখা দরকার যে, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ক্ষেত্রে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় অত ব্যাপক পরিসরের কোন প্রশাসনিক ঝামেলা থাকার কথা নয়।

ক্লাস চলাকালীন সময়ে রুটিন মাফিক নির্দিষ্ট ক্লাস নেয়া থেকে মাঝে মাঝে বিরত থাকার অভিযোগও শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শোনা যায়। সেশন জট সৃষ্টির ক্ষেত্রে এটিও একটি কারণ। তবে সকল শিক্ষকই যে এরূপ করেন তা নয়। হয়তো অধিকাংশ শিক্ষকের ক্ষেত্রেই এ অভিযোগ প্রযোজ্য নয়--কিন্তু যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাদের সংখ্যাটাও নেহায়েত অল্প নয়। কিন্তু শিক্ষকদের মধ্যে ক্লাস কামাইয়ের প্রবণতা সৃষ্টির কারণটি কি? অনেক কারণের একটি এই যে, আজকাল বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের অনেক শিক্ষককেই কাঁচা পয়সার লোভে বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সাহায্যদাতা প্রতিষ্ঠানের তথাকথিত সমীক্ষা ও গবেষণা প্রকল্পের উপদেষ্টা (কনসালটেন্ট) হিসেবে কাজ করতে দেখা যায়; এবং এ সকল কাজে তারা এতই ব্যস্ত থাকেন যে, আসল কাজ অর্থাৎ নিয়মিত ক্লাস নেয়ার জন্য তারা পর্যাপ্ত সময়ই করে উঠতে পারেন না। নিয়মিত ক্লাস নেয়ার ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করে এ জাতীয় 'কনসালটেন্সি ব্যবসা' অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত। এ ব্যাপারে প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য 'শিক্ষক আচরণ বিধিমালা' প্রবর্তন করা উচিত। বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের প্রকৃত গবেষণা ও উপদেশনা সেবার মাধ্যমে দেশ ও জাতি উপকৃত হোক--সে ব্যাপারে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু গবেষণা ও উপদেশনা সেবাকে কোন কোন শিক্ষক একে যেভাবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গ্রহণ করছেন তাকে কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না।

সেশন জটের ক্ষেত্রে ঘন ঘন ক্লাস বন্ধ থাকাটা একমাত্র কারণ না হলেও সেশন জট নিরসনের জন্য এ বিষয়টিকে অবশ্যই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত। শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র রাজনীতি এবং সেই সূত্রে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যকার সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে ইদানীং বার বার বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফলে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী শিকার হচ্ছে সেশন জটের ন্যায় এক ভয়ঙ্কর অভিশাপের। কিন্তু কেন এত ঘন ঘন এসব সংঘর্ষ ঘটছে বা ক্লাস-ছাত্রাবাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে? এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, এক্ষেত্রে পরোক্ষে জড়িত রয়েছে এক প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক শক্তি। এই প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক শক্তির প্রতিনিধি হিসেবেই কেউ কেউ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের তথা সমগ্র শিক্ষার প্রতি পরোক্ষ সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টির প্রয়াসে লিপ্ত রয়েছেন। এদেরকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে আখ্যায়িত করা হলেও এ প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে কিভাবে রুখতে হবে সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে কিন্তু এখনো পর্যাপ্ত সচেতনতা গড়ে ওঠেনি অথবা ওঠলেও তা এখনও ফলপ্রসূ হয়ে দেখা দেয়নি। এমতাবস্থায় যে বা যারা ঘন ঘন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়ার পেছনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ইন্ধন যোগান, তাদের সম্পর্কে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলকে আরো তৎপর হতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে সীমিত স্বায়ত্বশাসনও যারা ভোগ করছেন তাদের উচিত হবে সে অধিকারকে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করা। ক্লাস ছাত্রাবাস বন্ধ করে দিয়ে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ-পরিস্থিতিকে শান্ত করার প্রচেষ্টাকে আর যাই হোক, সুবিবেচনাপ্রসূত বলে আখ্যায়িত করা চলে না। এ ক্ষেত্রে তাই সংশ্লিষ্ট সকলকে অগ্রবর্তী চিন্তা-চেতনা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে যাতে শিক্ষাঙ্গনের এই অস্থিরতাকে ইতিবাচকভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব হয়।